পরিক্রমা

আমি গুরুং শরণম্

সংসারের নানা সমস্যায় জর্জরিত মানুষের মনে থাকে ইহকাল ও পরকালের আপনজনকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। ঘাতপ্রতিঘাতে ব্যাকুল হয়ে একটি নিশ্চিন্ত আশ্রয় সন্ধান করে জীব। যখনই এই স্বার্থপর সংসারের প্রবল আঘাত তার দেহ-মন দীর্ণ করে তখনই শাশ্বত অমৃতময় ঈশ্বরের চিন্তা জাগে। প্রশ্ন ওঠে আমি কে? কী জন্য জগতে এসেছি ও সুখ-দুঃখে আন্দোলিত হচ্ছি? এ-জগতে এমন কেউ কি আছেন যিনি আমার ভার নেবেন, অভয় দান করবেন? গুরুকরণের চিন্তা তখনই মনে ভেসে ওঠে। বলা হয়—শ্রীগুরুর সঙ্গে শিষ্যের জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ। একদিন না একদিন সেই 'জননান্তর-সৌহার্দ্য' আচ্ছন্ন করে সত্তাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ''যদি কারও ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে ও সে সাধন-ভজনের প্রয়োজন মনে করে, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি (ঈশ্বর)) তার সদ্‌গুরু জুটিয়ে দেন।'' সেই সদ্‌গুরু মায়ার সংসারের বন্ধন কাটিয়ে দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত সেই অদ্ভুত গল্প মনে পড়ে। শিষ্য পত্নীর ভালবাসায় মুগ্ধ। গুরুদেবকে বলেই ফেলল—ওরা তো আমাকে খুবই ভালবাসে, যত্ন করে। সংসারের স্বার্থের কলুষ ছবিটি তখনও শিষ্য জানে না। ভালবাসা কত ভঙ্গুর সে-সম্বন্ধেও কোনও ধারণা নেই। গুরুদেব তাকে নিয়ে যাবেন অমৃতের পথে অথচ শিষ্যের তেমন আগ্রহ নেই। গুরুপ্রদত্ত একটি বড়ি খেয়ে মৃতের মতো হলেও শিষ্যের জ্ঞান ছিল। দেখল ওই বড়ি খেয়ে মৃত্যু হবে জেনে মা-ও সন্তানের জন্য এগিয়ে এলেন না। স্ত্রী তো ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে বড়ি খেলই না, উপরন্তু 'ওঁর যা হবার হয়েছে' বলে নিয়ে যেতে বলল স্বামীকে। শিষ্যের মোহ ভঙ্গ হল। শ্রীগুরুর সঙ্গে সে অনায়াসে চলে গেল পিছনে না তাকিয়ে।

গুরুকরণের আগে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকতে পারে যেমন শ্রীশ্রীঠাকুর সংশয়াপন্ন শিষ্যকে রাতের আঁধারে অপেক্ষমাণ দেখে বলেছিলেন, ''বেশ, বেশ। সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি—তবে বিশ্বাস করবি।'' তবে বিশ্বাস করে গ্রহণ করার পর আর প্রশ্ন নেই। সে-বিশ্বাস অতি গভীর। সেখানে 'গুরু-ইষ্টকে অভেদ দর্শন'। এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণভাবে শিষ্যের বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই বোধবুদ্ধিই তাকে অগ্রসর করে দেয় গুরুশক্তির অনন্ত মহিমার পথে। তখনই বলা হয় 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ'। গুরুশক্তি ব্রহ্মাই এবং সগুণ গুরুশক্তি সর্বদাই সক্রিয় ও অশেষ কল্যাণের নিদান। গুরুকৃপায় শিষ্যের জন্মজন্মান্তরের সাধনার ধারার মুখ খুলে তার অধ্যাত্মপথ সুগম হয়।

সংসারের স্বার্থপূর্ণ ধারণার সঙ্গে সদ্‌গুরুর কোনও মিল নেই। যিনি জ্ঞানের আলোয় শিষ্যের চিত্তের অন্ধকার দূর করে তার জীবনের রূপান্তর ঘটান তাঁর সঙ্গে কার তুলনা? সেই গুরু অপার করুণার মূর্তি। শিষ্য হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর দিব্য গুণাবলি—''দেখিতে আমার পাওনা কো দোষ।/ নাহি অভিমান, নাহি তব রোষ।'' গিরিশবাবুর চরিত্রের দোষের কথা শুনলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অশ্বিনীকুমার দত্ত বললেন, ''শুনি মদ খায় নাকি?'' গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ফুটল এক নবীন আশ্বাসবাণী—''খাক না, খাক না কদিন খাবে?''

গুরু সম্বন্ধে শিষ্যের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, কারণ তাঁর স্বরূপ কী তা সকলের কাছে পরিষ্কার নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু আমাদের মতো সংশয়ী চিত্তকে প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়েছেন যা সাধনলভ্য—''সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। মানুষ গুরুর কাছে

যদি কেউ দীক্ষা লয়, তাঁকে মানুষ ভাবলে কিছু হবে না, তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে তো মন্ত্রে বিশ্বাস হবে।" গুরুর বাক্য অনুসরণ করে গেলে ভগবানকে লাভ করা যায়। একবার তাঁর প্রতি বিশ্বাস জন্মালে শিষ্য দেখতে পাবে তাঁর অপার করুণাময় রূপ। সে-রূপ অপার্থিব। জীবের জন্য অপেক্ষমাণ। গুরু যেন সেথো, হাত ধরে নিয়ে যান। তাঁর মতো বন্ধু এ-জগতে নেই। তাই বড় বড় বিপদ কাটিয়ে উঠলে আমরা তাঁকেই স্মরণ করে বলি—খুব গুরুবল। সেই বলে বলীয়ান অধ্যাত্মপথের পথিক নির্ভয়ে লক্ষ্যে এগিয়ে চলে—''তুমি যে আমার পরম বন্ধু/ আমার শত অনাদর লও সমাদরে অপার করুণাসিন্ধু।"

শিষ্যের ভুলভ্রান্তি শুধরে তিনি সঠিক পথে চালিত করেন করুণায়। সে-করুণার কোনও তুলনা মানুষের কাছে লভ্য নয়। যিনি জীবকে সৃষ্টি করেছেন সেই স্রষ্টার প্রেম, ভালবাসা, করুণা জীবকে ঘিরে থাকে। এমনকী জীব যখন জগতের প্রতি আসক্ত, তাঁর আহ্বান যখন তার অন্তরে পৌঁছয় না, তখনও তিনি অপেক্ষা করেন এবং শেষপর্যন্ত তার সত্তাকে মুক্ত করে পরমার্থলাভ করিয়ে দেন। দেহধারণ করে শ্রীগুরু শত শত জীবের সঙ্গে লীলা করেন এবং তাদের অজ্ঞাতসারে অমৃতের উৎস প্রবাহিত করেন। একবার বেলুড় মঠে একটি ব্রহ্মচারী সায়াটিকার যন্ত্রণায় শয্যাগত। সে মনে মনে ভাবছে রাজা মহারাজ বা শ্রীশ্রীমা থাকলে তাকে ওই যন্ত্রণার শিকার হতে হত না। তাঁদের আশীর্বাদে সে নিরাময় হতে পারত। একদিন অতিকষ্টে গুরুদর্শনে গেল সে। তার গুরু স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী অধ্যক্ষপদে আসীন। তিনি তাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলেন। সেদিন থেকেই ব্রহ্মচারী সুস্থ হল। মহারাজ তিনদিন তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করলেন। তিনি সুস্থ হলে সেই ব্রহ্মচারী প্রণাম করতে এল। তিনি বললেন, "Always remember that there are other things to be asked from Guru." তার যন্ত্রণা লাঘব করেও তাকে শেখালেন, গুরুর কাছে আরও বড় বস্তু চাওয়া উচিত।

একপ্রকার শুদ্ধ অনাবিল গুরুভক্তির কথা অর্জুনের প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মুখে যা বলতেন, অর্জুন তাই দেখতে পেতেন। এটি প্রবল বিশ্বাসের সুফল। গুরুবাক্যে বিশ্বাস মানে ওইরকম বিশ্বাস।

শ্রীগুরু বহু নামরূপযুক্ত মায়িক ভাবের মধ্যে একটি রূপ ও একটি নাম প্রদান করেন। সেই গুরুদত্ত নাম বা বীজমন্ত্র অতিশক্তিশালী। রামপ্রসাদ তাঁর সংগীতে ইঙ্গিত করেছেন—''গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে ভক্তিবারি সেঁচে দে না।"

পতিত মানবজমি আবাদ করতে গুরুদত্ত বীজ রোপণ। ভক্তিবারি সিঞ্চন করে তবে তার অঙ্কুরোদ্‌গম এবং পরে ফলন। তারপরে সোনার ফসল তোলা। এইটি শিষ্যের কৃত্য। গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রটি একান্তে জপ করতে করতে সেটিতে চৈতন্যের আধান হয় এবং ধীরে ধীরে নাম ও নামী অভেদরূপে চিত্তে জেগে ওঠেন। বারবার জপমন্ত্রের আবৃত্তি অধ্যাত্মজগতে একটি পন্থাবিশেষ। তার অন্তরালে কাজ করে গুরুশক্তি।

মন্ত্রদাতা গুরু এক কিন্তু উপগুরু একাধিক হতে পারেন। তার প্রমাণ ভাগবতে অবধূতের প্রসঙ্গ। ব্যাধ, মৎস্য, চিল প্রভৃতি সকলকেই তিনি প্রণাম করলেন। তারা যেমন পার্থিব বস্তুলাভের জন্য একাগ্রচিত্ত, ভগবানকে ডাকার সময় যেন তাঁরও ওইরকম অখণ্ড মনোযোগ ও তীব্র একাগ্রতা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব সঞ্চারের মধ্যে আমরা গুরুশিষ্যের গভীর সম্বন্ধের পরিচয় পাই। আমাদের ভিতরই সমুদয় জ্ঞান আছে। কিন্তু সেই জ্ঞানের উন্মেষের জন্য একটি জানা ব্যক্তির প্রয়োজন। যিনি অনায়াসে শিষ্যের

জ্ঞানোন্মেষ ঘটিয়ে দেন তিনিই গুরু। শিষ্য অনুভব করেন—

''তুমি যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া
'ভয় নাই' বলে পথ দেখাইয়া
আগে আগে যাও, ফিরে ফিরে চাও
বুঝিয়া আমারে ভীরু।''

অধ্যাত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুভবী, শক্তি সঞ্চারকারী গুরুর প্রয়োজন। গুরু বলতে আমরা ভারতে 'গ্রন্থকীট' অর্থাৎ শাস্ত্রনিষ্ণাত ব্যক্তিকেই বোঝাই না। স্বামীজীর ''আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করেছেন?''—এই কথার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ''তোকে যেমন দেখি, তার চেয়ে স্পষ্ট করে দেখেছি, তোকেও দেখাতে পারি।'' এই অপূর্ব উত্তর শিষ্যকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। শ্রীগুরুর কাছে এইটিই তো কাম্য। গুরু শুধু নিজে অনুভব করেননি, তিনি শিষ্যকে অনুভব করিয়েও দিতে পারেন। অর্থাৎ যে-ব্যক্তির আত্মা থেকে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয় তিনিই তো শক্তিসঞ্চারক গুরু। শক্তির সঞ্চার ও সে-শক্তিগ্রহণ—এই দুটিই গুরুশিষ্যের মধ্যে এক অপূর্ব বন্ধন। এই জ্ঞান স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের অজ্ঞান-অন্ধকারও দূর হয়, যেমন আলো জ্বাললে অন্ধকার বিলীন হয়ে যায়, তার অস্তিত্বই থাকে না।

হৃদয় ও মনের অখণ্ড পবিত্রতা ভিন্ন এই ভাবসঞ্চার সম্ভব নয়। যে-গুরু কল্পতরুরূপে শিষ্যকে আপন স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় দেন তিনি প্রেমঘন দৈব সত্তা। পবিত্রতার মূর্তি তিনি। সেখানে অর্থ, নাম-যশ অথবা কোনওরকম স্বার্থসিদ্ধির আবিলতা নেই। সেই নিষ্পাপ, নিঃস্বার্থ প্রেমভক্তির আধারই শ্রীগুরুপদবাচ্য। তাঁর করুণা অহেতুক। সেই করুণার সাগর ঈশ্বরের সঙ্গে সদাই যুক্ত।

সাধারণভাবে এই দৈবীগুণযুক্ত মানুষ দুর্লভ হলেও বিরল নয়। ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে, মঠে-মন্দিরে কত প্রেমিক শিষ্যবৎসল সাধু আছেন। তাঁরা অবতারকোটির না হলেও ঈশ্বরপরায়ণ, চৈতন্যবান। পবিত্র তাঁদের জীবনচর্চা, তপস্যাপূত তাঁদের সত্তা। তাঁদের স্বার্থহীন জীবনচর্যা সাধারণ মানুষের মনে আলোক বর্ষণ করে। তাঁরা অধ্যাত্ম-আলোকবাহী সত্তা যাঁরা নিজেরাও অগ্রসর হন এবং বড় নৌকার মতো বহু মানুষকে সংসারের পারে অনায়াসে নিয়ে যান। তাঁরা দেহধারী হয়ে মানুষের কাছে পরম আশ্রয় হন। অতি প্রসন্নতায় শিষ্যদের গ্রহণ ও পরিচালিত করেন কাঙ্ক্ষিত পথে। সদ্‌গুরুরূপে শিষ্যেরা তাঁদের পান একান্ত আপন ও অতি অন্তরঙ্গভাবে। সেই পরম গুরুর বিচিত্র মহাপ্রকাশকে প্রণতি জানাই—

নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্॥ ✠